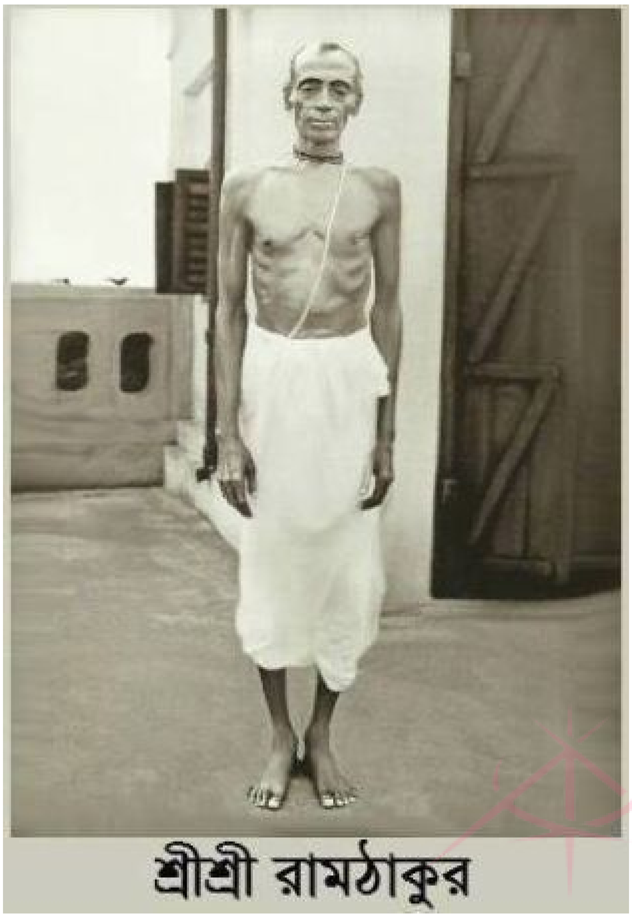

শ্রীশ্রী ঠাকুর রামচন্দ্র দেব-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীশ্রী ঠাকুর রামচন্দ্র দেব-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী.....................
শ্রী ঠাকুরের পিতা রাধামাধব চক্রবর্তী অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ও ঐকান্তিক ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর কুলগুরু ছিলেন সিদ্ধতন্ত্রাচার্য মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়পঞ্চানন। তাঁর সাধনক্ষেত্র "পঞ্চবটী" এখনও তাঁদের বড়ির পূর্বপার্শ্বে বিদ্যমান। তিনি সারাজীবন নিরামিষভোজী ছিলেন। তিনি শীতকালের কনকনে ঠাণ্ডা সহ্য করার অদ্ভুত শক্তি অর্জন করেছিলেন। এই তান্ত্রিকসাধক মাঘ মাসের ভয়ানক শীতের রাত্রিতেও পুকুরের জলে দাঁড়িয়ে আহ্নিক করতেন। শ্রীশ্রী ঠাকুরের মাত্র ৮ বৎসর বয়সে ১২৭৩ বাংলা সনে প্রায় ৫০ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ করেন। পিতার মৃত্যুতে শ্রীশ্রী ঠাকুরের শিশুকালকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়।
শ্রীশ্রী ঠাকুরের জননী শ্রীমতী কমলাদেবী ছিলেন অতিশয় পুণ্যবতী, সহজ-সরলা, উদার ও পরোপকারী। ধর্মে তাঁর ভক্তিপরায়ণতা ও ঐকান্তিকতার জন্য সুখ্যাতি ছিল। তিনি কৃচ্ছ্রসাধন ও ব্রতাদি পালনে সদা-সতর্ক থাকতেন। তিনি নিজের সুখ-সুবিধার কথা চিন্তা না করে পরের সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ রাখতেন বেশি। তিনি ১৩১০ বাংলার জ্যৈষ্ঠ মাসে ১৯০৩ ইং সালে স্বর্গারোহণ করেন।
শ্রীশ্রী ঠাকুরের পৈত্রিক আদিনিবাস ছিল ফরিদপুরের (দক্ষিণ বিক্রমপুরের) জপসা

গ্রামে। জপ্সা গ্রামটি ডিঙ্গামানিক থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত। নানা কারণে জপ্সা গ্রামের সুখ্যাতি ছিল। বিদ্যালঙ্কার পরিবার ছিল সেই গ্রামের এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পরিবার। রাধামাধব চক্রবর্তীর পিতার নাম ছিল রামজয় চক্রবর্তী। তিনি জপ্সা গ্রামে পরলোকগমন করেন। পদ্মার শাখানদী কীর্তিনাশার করাল গ্রাসে বাপদাদার ভিটেমাটি নিশ্চিহ্ন হওয়ার কারণে শ্রীশ্রী ঠাকুরের পিতা রাধামাধবকে জপ্সা গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে হল ডিঙ্গামানিক গ্রামে। সেখানে তিনি কমলাদেবীর পাণিগ্রহণ করে বসবাস শুরু করেন।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের মাতা কমলাদেবীর পিতামহ শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন একজন প্রখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তৎকালীন রাজা রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত রাজনগরের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন তিনি। তৎকালীন যুগের প্রথানুসারে রাজা থেকে পুরস্কারস্বরূপ ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি লাভ করেন পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়। ওয়ারিশ সূত্রে উক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের মালিক হন তাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্র সদানন্দ ভট্টাচার্য। তিনি স্বর্গারোহণ করলে উক্ত সম্পত্তির অধিকারী হন তাঁরই একমাত্র কন্যাসন্তান কমলাদেবী।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের যমজভাই লক্ষ্মণসহ চার ভাই ও এক ভগ্নী ছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা কালীকুমার ছিলেন ধর্মপরায়ণ ও পরোপকারী ব্যক্তি। যৌবন বয়সে তিনি কঠিন বাতরোগে আক্রান্ত হয়ে পিতার চেষ্টায় মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এলেও পা দুইটি শুকিয়ে চিরতরে পঙ্গুত্ববরণ করে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তিনি ঈশ্বরের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে পূজার্চনা নিয়ে পড়ে থাকতেন। দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগবন্ধু ছিলেন অতিশয় সরল ও উদার প্রকৃতির লোক। তিনি ১৩৩৩ বাংলার ২৪ ভাদ্র তারিখে পরলোকগমনের সময় শ্রীশ্রী ঠাকুর উপস্থিত থেকে অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়ায় যোগ দেন। শ্রীশ্রী ঠাকুরের যমজ কনিষ্ঠ সহোদর লক্ষ্মণ ঠাকুর ছিলেন পরোপকারী, কষ্টসহিষ্ণু, ধর্মপ্রেমভক্তিসম্পন্ন মহৎচরিত্রের অধিকারী। হরিনাম শ্রবণে তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হয়ে আত্মসংবরণ করতে না পেরে সর্বশরীর কাঠের মত শক্ত ও চক্ষু পলকহীন অবস্থায় স্থির হয়ে থাকত। অকৃতদার লক্ষ্মণ ঠাকুর আর্তপীড়িতের সেবায় সবসময় উন্মুখ হয়ে থাকতেন। তিনি প্রায় ৫৭/৫৮ বৎসর বয়সে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। শ্রীশ্রী ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা একমাত্র ভগ্নী কাশীমণি দেবী ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সরল ও মধুর স্বভাবের। তাঁর মধুর ব্যবহারের জন্য সবাই তাঁকে ভালোবাসতেন।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে মাতা-পিতার যত্নের কোন ত্রুটি ছিল না। সুযোগ-সুবিধার অভাবও ছিল না। কার্তিকপুরের মুসলমান জমিদার বাড়ির সামনে তৎকালে একটি মাধ্যমিক ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল যা পরবর্তীতে কার্তিকপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেই বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রী ঠাকুরকে ভর্তি করা হল। কিন্তু তিনি অন্যান্য বালকের ন্যায় স্কুলে যাতায়াত করলেও বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে তাঁর তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। এই অনাগ্রহের কারণে পরবর্তীতে তিনি আর বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেন নি।

বাল্যকালে শ্রীশ্রী ঠাকুর অন্যান্য বালকের ন্যায় খেলাধুলায় মত্ত থাকলেও অন্যান্য বালকের মত তিনি চঞ্চল ছিলেন না। ধৈর্য, স্থৈর্য ও গাম্ভীর্যের চরিত্র ফুটে উঠত তাঁর ভিতর। ছোট-বড় সকলেই তাঁরই সরলতা, মৃদু আলাপ ও সুমধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হত। তিনি বাল্যকাল থেকে অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু, অধ্যবসায়ী ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন। মাতা-পিতা, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশীসহ গুরুজনদের প্রতি তিনি একান্ত শ্রদ্ধাপরায়ণ ও অনুগত ছিলেন। তিনি সংসারের অতিশয় কষ্টসাধ্য কাজগুলো নির্বিকার চিত্তে সম্পন্ন করতেন। বাল্যখেলোতে সমবয়সীদের নিয়ে

মৃত্তিকার দেবে-দেবীর মূর্তি তৈরি করে কীর্তনে নেচে-গেয়ে পরমানন্দে পূজার্চনা করতেন। পারমাত্মিক সংগীতের প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা ছিল। তৎকালে সেই অঞ্চলে রামায়ণ গান শুনতে যেতেন বিভিন্ন জায়গায় গানের আসরে। শ্রীশ্রী ঠাকুর একসময় মাকে বললেন, ''মা, রামায়ণ গানে কেবল আমার ও লক্ষ্মণের কথাই তো বলে"। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ ইত্যাদি ধর্মগ্রন'পাঠ মনোযোগ সহকারে শুনে হুবহু বলার ক্ষেত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি শ্যামাসংগীত খুব ভালবাসতেন। কেহ ভক্তিগীতি গাইলেই তন্ময় হয়ে শুনতেন। তিনি বাইরের যাবতীয় কাজকর্ম করলেও চিত্ত ছিল অন-র্জগতে।
শ্রীশ্রী ঠাকুরের পিতৃদেবের স্বর্গারোহণ এবং কিছুকাল পরে তাঁর পিতার গুরুদেব মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়পঞ্চানন-এর দেহত্যাগ বালক রামচন্দ্র দেব-এর জীবনে নিয়ে আসে এক পারমাত্মিক পরিবর্তন। তিনি হয়ে গেলেন উদাস, নীরব, নিথর। তাঁর এই ভাবান-রে অভিভাবকসহ স্থানীয় সকলকে ভাবিয়ে তুলল। নয় বৎসর বয়সের রামের এই ভাবান-রের কথা চিন্তা করে কেউ কেউ মনে করলেন, শাস্ত্রানুসারে উপনয়ন সংস্কার হলে হয় তো মতিগতির পরিবর্তন হতে পারে। শ্রীশ্রী ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কালীকুমার চক্রবর্তী ''আচার্য" হয়ে রাম-লক্ষ্মণ-এর উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন করলেন। তৎকালীন সমাজে উপনয়নের পূর্বে পঞ্চগব্য খাওয়ার ব্যবস্থানুযায়ী তাঁদেরও পঞ্চগব্য ভক্ষণ করালেন। সেইদিনই ঠাকুর চিরদিনের মত ত্যাগ করলেন অন্ন। যদিও দু'একবার ব্যতিক্রম হয়েছে, তা কেবল মা-জননী ও বিশেষ ভক্তদের অনুরোধে। কিন' সে অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে অসুস' হয়েছেন বারে বারে। উপনয়নের পর মা কমলাদেবীকে নিয়ে দণ্ড ভাসানোর সময় দর্শন হল এক সৌম্য সন্ন্যাসীর। তিনি অপলক দৃষ্টিতে রামের দিকে তাকিয়ে মা কমলাদেবীকে প্রার্থনা নিবেদন করে বললেন, ''তোমার এ ছেলেটি আমাকে দিয়ে দাও"। একি! আবার অলক্ষুনে কথা? রাম যে আমার নয়নের মণি। এমন ছেলেকে কি কেউ সন্ন্যাসীর হাতে তুলে দেয়! সেইদিন সন্ন্যাসী রিক্তহসে- ফিরে গেলেও তাঁর গহীন অন-রে গ্রথিত হয়ে রইল রাম-তনু। উপনয়নের পর প্রব্রজ্যাসক্ত মনের উপসম না হয়ে বরং গড়ে উঠল প্রকৃতির সংগে নিবিড় নৈকট্য। অসীম আকাশে মুক্তালয়ে যেন গৈরিক আলোকবর্তিকা হাতছানি দিয়ে আহ্বান করছে। রাম এখন গায়ত্রীমন্ত্র জপের মধ্য দিয়ে আহ্নিক নিয়ে পড়ে থাকেন। এই জপের জ্যোতিতে রাম এক ঐশ্বরীয় শক্তির আবেশে উদ্ভাসিত হতে থাকেন। অলৌকিক নিয়ন্তার আবাহনে চলে যেন তাঁর সমর্পিত জীবন। অন-রাত্মার মধ্যে যেন এক অনির্বাণ জ্যোতি স্ফুরিত হয়ে ভগবদ্ধামে নিজেকে লয় করিয়ে নিচ্ছেন।
পিতৃদেবের দেহত্যাগের পর প্রায় চার বৎসর অতিবাহিত হল। এমনি এক সময়ে রামের জীবনে এল শুভ লগন। যথারীতি বালক রাম রাত্রিতে পরম শানি-তে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। হঠাৎ স্বপ্নযোগে তাঁর সমনে উদ্ভাসিত হল সৌম্য, শান- এক সন্ন্যাসী। কানের কাছে সন্ন্যাসী বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে বললেন, ''বৎস! প্রতিদিন নিবিষ্টমনে এই শক্তিমন্ত্র জপ করে যাও, মুক্তির পথ তোমার অচিরেই উন্মুক্ত হয়ে যাবে"। স্বপ্নশ্রুত মন্ত্রের অমোঘ প্রভাবে বালক রামের অন-র্জীবনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন-র্লীন এক মহাশক্তি জন্মান-রের সাত্ত্বিক সংস্কাররূপে প্রকট হয়ে ধ্যানস্রোতে বিকশিত হতে থাকে। বালক রাম প্রচ্ছন্নে থাকতে চাইলেও দৈবীকৃপাপ্রাপ্ত ঐশ্বরীয় প্রসাদের নতুন স্বরূপটি ক্রমে বাড়ির লোকের কাছে প্রকাশ হতে থাকে।
প্রায় বার বৎসর বয়সে শ্রীশ্রী ঠাকুর তাঁর এক দূর সম্পর্কের পিসিমাকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলার চন্দ্রনাথ তীর্থ পরিভ্রমণ, অর্থ উপার্জনের জন্য বাংলাদেশের ফেনী শহরে এক উকিলবাবুর বাসায় পাচকবৃত্তির

সময়, উকিলবাবুর আয়োজিত কালীপূজায় অলৌকিক ঘটনাসহ অসংখ্য বিভূতি প্রকাশ হয়ে পড়লে রাম লোকালয়ের বিভিন্ন এলাকায় নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে এক স্বপ্নীল আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করে দিনাতিপাত করতে থাকেন।

পারমাত্মিক জগতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করার মানসে, অন-রের অরুন'দ আর্তিতে, ইচ্ছাহীন এক অভিলাষে ঐশীশক্তির সাথে পরম পুনর্মিলনের এক দুর্নিবার আকর্ষণে কণ্টাকাকীর্ণ ঘনঅরণ্য গিরিসিঙ্কট আচ্ছাদিত বহু পথ অতিক্রমে বালক রাম পৃথিবীর অন্যতম মহাশক্তির আধার শক্তিপীঠ কামরূপ কামাখ্যার তীর্থপীঠে বাৎসরিক অম্বুবাচির উৎসবে দৈবিক তৃষিত-মর্মর-হৃদয় আকাঙ্ক্ষিত মহালগনের অপেক্ষায় জপরত ছিলেন। এই মহাতীর্থে শ্রীশ্রী ঠাকুরের সাথে তাঁর গুরুদেব ‘‘শ্রীঅনঙ্গদেব”-এর সাথে প্রথম সশরীরে সাক্ষাৎ হয়। গুরুর সাথে সাক্ষাৎ পরবর্তীতে শ্রীশ্রী ঠাকুর আনুষ্ঠানিক দীক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং হিমালয় পরিভ্রমণ শুরু হয়।

তপস্যাপুত হিমালয় পরিভ্রমণের সময় তাঁর গুরুদেবের অতিপ্রাকৃত অলৌকিক শক্তির কৃপাবলে অসংখ্য অতিপ্রাকৃত সাধনক্ষেত্র, সিদ্ধপীঠ, রহস্যময় দেব-দেবী, বহু ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষের দুর্লভ সান্নিধ্যলাভ করে নিজেকে পরিপূর্ণ এক ব্রহ্মবিদ হিসেবে ধরাধামে পারমাত্মিক লীলার অমৃতধারা প্রবাহিত করার নিয়তির এক অদম্য ইচ্ছার প্রতিফলনে ঐশীশক্তির মহামিলনের এক মহাদায়িত্ব নিয়ে তিনি লোকালয়ে ফিরে আসেন।

গুরুদেব-এর স্বরূপ সত্তার ছোঁয়ায় উজ্জীবিত হয়ে শ্রীশ্রী ঠাকুর সাধনজগতের বৈচিত্রিক লীলাকে তাঁর পরিভ্রমণের পাথেয় করে নিলেন এবং গুরুর আদেশকে শিরোধার্য করে পাপভারাক্রান- বেদনার পঙ্কিলে আবর্তিত জীবকে পরমানন্দের পরমাত্মায় মহামিলনের এক অব্যর্থ পরিব্রাজনে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। সেই থেকেই তিনি পৃথিবীর অন্যতম সাধনপীঠ ও মহাসাধকদের পদচারণায় ধন্য অবিভক্ত ভারতের একটা বিশেষ অংশে বিভিন্নভাবে অবহেলিত মানবতার মানবিকতাকে জাগ্রত করার মানসে তাঁর অভিযাত্রা শুরু করেন। তিনি মানবিকতার পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে মানবতার আধ্যাত্মিক মহামুক্তিতে কৈবল্যপ্রাপ্তির জন্য ‘‘শ্রীনাম” বিতরণ শুরু করেন। ‘‘কলিকালে মহামন্ত্রই একমাত্র জীবাত্মা ও পরমাত্মার মহামিলনের পথ” এটাই শ্রীশ্রী ঠাকুরের অন্যতম বেদবাণী।

তিনি আবির্ভাব থেকে তিরোধান পর্যন- অসংখ্য পারমার্থিক লীলার বিচ্ছুরিত আলোতে অধঃপতিত মানবতাকে তাঁর ব্রহ্মবিদ্স্বরূপ প্রকাশ করে মানবতার আধ্যাত্মিক মুক্তির পথকে আরও সুগম করে দিয়ে গেছেন। তাঁর জীবনটাই ছিল অন-হীন লীলার ভাণ্ডার। তাঁর দেহত্যাগের বর্তমান প্রায় ৫০ বৎসর পরও ঐকানি-ক ভক্তদের সাথে প্রতিনিয়ত ঐশ্বরিক শক্তির দৈবলীলার আলোতে প্রকটভাবে নিজেকে অম্লান করে রেখেছেন।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের আদর্শকে লালন ও ধারণ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য একনিষ্ঠ ভক্তরা ‘‘শ্রীনাম”-এর মহাশক্তিকে অবলম্বন করে তাদের নিত্য-জীবনকে কলুষমুক্ত করার মাধ্যমে পারমাত্মিক জীবনের মহালয়ে আবৃত হওয়ার অদম্য আর্তিতে প্রতিনিয়ত প্রার্থনা চালিয়ে যাচ্ছেন। শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথের পরমকৃপার পরশে রামভক্তসহ সকল মানবাত্মা তাদের জীবন-চলার পথকে রামময় করে আনন্দলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার অদম্য ইচ্ছায় কাজ করে যাচ্ছে।

দীর্ঘ প্রায় ৯০ বৎসরের জীবনের অসংখ্য প্রকটলীলার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে সকল

ধরনের বৈষম্যহীন, কুসংস্কারমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে মানবতার মানবিক গুণাবলিকে জাগ্রত করে মানবতার আধ্যাত্মিক মুক্তির পথকে সুগম করার অভিপ্রায়ে শ্রীশ্রী ঠাকুরের আলোকিত জীবনের আলোকবর্তিকার বিচ্ছুরিত আলোতে বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার চৌমুহনী এলাকায় তাঁর ঐকান্তিক ভক্ত উপেন্দ্র সাহার বাংলোতে ১৩৫৬ বাংলার ১৮ বৈশাখ ১৯৪৯ ইং সালের ১ মে, রবিবার, বেলা ১.৩০ মি. সময় পুণ্য অক্ষয়তৃতীয়া তিথির মাহেন্দ্রক্ষণে সত্যের পূজারি মহাসাধক শ্রীশ্রী ঠাকুর রামচন্দ্র দেব লক্ষ লক্ষ ভক্তপ্রাণকে নয়নের জলে ভাসিয়ে মহাপ্রয়াণ করলেন। তিনি যে কক্ষে দেহত্যাগ করলেন সেখানে তাঁর সমাধিক্ষেত্র নির্ধারিত হয় এবং সেখানে অপরূপ স্থাপত্যশৈলীতে অনিন্দ্যসুন্দর সমাধিমন্দির বর্তমানে বিদ্যমান। প্রতি বছর সেখানে তিরোধান দিবসে অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগমে আনন্দময় পরিবেশে এক বিশাল মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিয়ত অসংখ্য ভক্তপ্রাণ মানুষ শ্রীশ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে সমর্পিত হয়ে ত্রিতাপজ্বালা মোচনের এক অদম্য বাসনায় সমাধিক্ষেত্র দর্শন করেই চলেছেন।

Published on: Feb, 16 2023 11:06